দৈনিক ইনকিলাব
014
তারিখ 06 FEB 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2
শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

শিক্ষাঙ্গন থেকে ইসলামী প্রভাব উঠে যাচ্ছে

— মোঃ নূরুল হক

বলা হয়, শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানী, গুণী, সদাচারী, নম্র ও খোদাভীরু করে তোলে। ভাল-মন্দ বুঝবার, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার ক্ষমতা দেয় এবং সৃষ্টি জগতের রহস্যাবলী জানতে, বুঝতে এবং উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে। আল্লাহর অসীম কুদরত ও ক্ষমতাবলী জানবার ও বুঝবার সহায়ক হয়। আল্লাহ বলেছেন, "আমি জ্বীন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" এই জন্যই তাঁর সৃষ্টি মাহাত্ম্য সম্বন্ধে চিন্তা ও ধারণা করার এবং জানার লক্ষ্যেই প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞানার্জন ফরজ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ যে কুরআন নিজে শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।" (আল-হাদীস)।

বাংলাদেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু তাতে কী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে? যে শিক্ষা আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় সে শিক্ষায় লাভ কি? তাহলে এত পরিশ্রম, এত অর্থ ব্যয়, এত সময়ক্ষেপণ কিসের জন্য? বাংলাদেশে এখন যে শিক্ষা চলছে তা কি আল্লাহ-রসূলকে জানার বা বুঝার জন্যে?

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশাসনের আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান।

আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য। যদি তাঁকে জানার ও শিখার মতো কোনো ব্যবস্থা না-ই থাকে তাহলে এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেখে লাভ কি?

যে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে আল্লাহর নাম নেই, ছেলে-মেয়েরা ইসলামী রীতি ভুলে অবাধে মেলামেশা করে, বিজাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয় শিক্ষার্থীরা, সেই শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কতোটুকু থাকা উচিত সেটা একটা প্রশ্ন।

বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে ধর্মীয় ভাষা পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ফলে, মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা এই ভাষা লিখতে ও পড়তে অভ্যস্ত ছিল। এবং বেশ উৎসাহও পেতো। তারা ইসলামের সব বিধি-নিষেধ মেনে চলত। বহু ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক ঠিকমত নামাজ-রোজা আদায় করতো। ইসলামী আহকাম, রীতি-নীতি মেনে চলতে বাধ্য হতো। ইসলামের পোশাক-পরিচ্ছদ, টুপি ইত্যাদি পরতে কেউ লজ্জাবোধ করতো না। মেয়েরা শরীর ঢেকে শিক্ষাঙ্গনে আসা-যাওয়া করতো। কেউ ধর্মীয় রীতি-নীতি ভেঙ্গে চলাফেরা করতে সাহস পেতো না। কারণ ধর্মীয় শিক্ষাই মানুষের চরিত্র গঠনে, চাল-চলনে বেশী প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমান দুঃখজনকভাবে আরবী ভাষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে। আমি মনে করি, আরবী আল্লাহর ভাষা। প্রায় ১১০ কোটি মুসলিমের একমাত্র ভাষা। তাই এ ভাষায় রচিত সাহিত্যও প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর পাঠ করা আবশ্যক। কিন্তু আরবী ভাষাকে বর্তমানে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সরকারী পাঠক্রমে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। যার ফলে দেশের হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দু'চারটির মধ্যেও আরবী ভাষার চর্চা আছে কি-না সন্দেহ।

আরবী ভাষা অবশ্য পাঠ্য না থাকায় ইসলামী আরবী শিক্ষা একমাত্র মাদ্রাসাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯৮৬ সালেরB.T.A-এর টেস্ট পেপার এর প্রমাণ। এতে আরবী ভাষার কোন প্রশ্নপত্রই সন্নিবেশিত হয়নি। অনেকে মনে করেন যে, ইসলামী শিক্ষা বা আরবী ভাষা শিক্ষা এক, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। ভাষা শিক্ষা ছাড়া ধর্ম শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

বর্তমান স্কুল-কলেজে দু'-একজন করে মৌলবী সাহেব নিয়োজিত আছেন। অথচ ইসলামী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার কোনো অগ্রগতিই হচ্ছে না। আমাদের ছেলে-মেয়েরা এম এ পাশ করে যদি মহাগ্রন্থ পবিত্র "কোরআন" পর্যন্ত পড়তে না পারে বা কোরানের বাণী বুঝতে না পারে, তাহলে সে সারা জীবন স্কুল-কলেজে শিখলো কি? শিক্ষক-শিক্ষিকারাই বা কি শিখালেন? জীবনের সবচেয়ে আসল দিকটা বাদ দিয়ে অন্য কিছু শিখলেই কি মোক্ষ্য লাভ হয়ে যাবে? আমার মতে, অশিক্ষা-কুশিক্ষার পরিবর্তে অজ্ঞ থাকাই উত্তম। প্রবাদ আছে"Ignorance is a bless"অর্থাৎ অজ্ঞতা একটি আশীর্বাদ। প্রকৃতপক্ষে ইসলামিক ও ধর্মীয় সাহিত্য অত্যাবশ্যক পাঠ্য না হওয়ায় ইসলামিক বা অন্য কোন ধর্মীয় পরিবেশ, ধর্মীয় আহকাম শিক্ষাঙ্গন হতে বিদায় নিয়েছে। এখন আর মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা নামাজ-রোজার ধার ধারে না। অনেকে আরবী ভাষা পড়তে লজ্জাবোধ করেন। মেয়েদের সতর বা পর্দায় বা সমস্ত শরীর ঢেকে স্কুল-কলেজে আসা-যাওয়া করতে তাগিদ দিতে লজ্জাবোধ করেন। তাদের মধ্যেই যখন ইসলামি নেই, ছেলে-মেয়েদের কিভাবে তারা উপদেশ দেবেন?

বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে ইসলামিয়াত নামক বই পাঠ্য আছে ঐচ্ছিক রূপে। এটা বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলেও পাঠ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে পাঠ্য থাকা না থাকা একই কথা। কারণ, এখন ইসলামিক সংস্কৃতি ও নিয়ম-কানুনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। ঐ বইটি পড়েও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ইসলামী পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি আকর্ষণ নেই, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেও নেই। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যদি ইসলামী রীতি পালনের অভ্যাস থাকতো তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও থাকতো। আশ্চর্যের বিষয়, দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় ইসলামিয়াত প্রশ্নপত্রে কোরআনের আরবীকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বাংলা অক্ষরে কোরআনের সুরাগুলি লেখা হচ্ছে। এতে বুঝা যায়, ভবিষ্যতে মুসলমান ছেলে-মেয়েদের আর আরবী ভাষায় "কোরআন" পড়ার কোন সুযোগ থাকবে না। এদের এভাবে পবিত্র কোরআন পাঠ থেকে বঞ্চিত রাখার অধিকার কারো আছে বলে মনে করি না। এটাকে আমরা কোরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধে সীমাহীন স্পর্ধা প্রকাশ বলেই মনে করি। আমাদের বিশ্বাস, কোরআনের সুরা ও হাদীসগুলি বাংলা অক্ষরে না ছাপিয়ে আরবী অক্ষরে লিখলে মুসলমান ছাত্ররা আরো ভালভাবে আরবী ভাষা তথা কোরআন শরীফ পড়া শিখতে, পড়তে, অর্থ বুঝতেও অভ্যস্ত হত। এতে মনে হয় যে, পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা শিক্ষাঙ্গনে ইসলামী আদর্শ চান না। আরবীর প্রতি এইরূপ অবমাননাকর আচরণকে আর প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়।

শিক্ষাঙ্গনে সহশিক্ষা ও পর্দাহীনতার প্রচলন পরিবেশকে যেমন কলুষিত করে তেমনি তার প্রভাব সমাজের উপরেও পড়ে। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে এখন চিন্তার সময় এসেছে। পর্দাহীনতা ও ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশায় অনেক অপরাধের জন্ম দেয়।

পর্দা বলতে আমরা অবরোধের কথা বলছি না। মেয়েরা সমস্ত 'সতর' ঢেকে অর্থাৎ সমস্ত শরীর মাথা, হাত, পা ঢেকে দরকার হলে যে কোন জায়গায় যেতে বা প্রয়োজনে যে কোন কাজ করতে এতে বাধা নেই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, ক্রমবর্ধমান হারে মহিলারা পর্দা ছেড়ে দিচ্ছেন। এটা সত্য যে, পর্দা মেয়েদের অনেক সময় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লার নিয়ম কানুনে কখনো কোনো পরিবর্তন দেখবে না। কেউ এর পরিবর্তন করতে পারবে না।"

উপসংহারে বাংলাদেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর প্রতি অনুরোধ, তারা যেনো মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিমুখী পাঠ্যক্রমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন।